মহিউদ্দীন আহমেদ
প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র
হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
রুম নং: ২০১-সি, পল্টন টাওয়ার (৩য় তলা)
৮৭, পুরানা পল্টন লাইন, (বক্স কালভার্ট লেন)
ফোন: (+৮৮০২) ৮৩৩১৭২৭
মোবাইল : ০১৭১৩ ০০৮৮২২
ফ্যাক্সঃ (+৮৮০ ২) ৮৩৩২৩১৭

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
গণমানুষের মুক্তির আন্দোলন

তারিখঃ ১২/১২/২০০৬

চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাঃ মার্কিন-ভারত ভূমিকা

১. সূচনা

যে কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বাংলাদেশের রাজনীতির দু'টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একমত হবেন, প্রথমতঃ বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ এদেশের রাজনীতিতে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ সবসময় কমবেশী থাকলেও বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই হস্তক্ষেপ দিন দিন প্রকাশ্য রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে ষোল বছরের তথাকথিত গণতন্ত্র ২৮শে অক্টোবর ২০০৬ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে ভীষণ হোচট খেয়েছে। আর দেশের এই ক্রান্তিকালে বিদেশীদের কার্যকলাপ জনমনে ব্যাপক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এদেশের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ভূমিকা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। এই নিবন্ধ বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিনী ও ভারতীয় স্বার্থের আলোকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিশ্লেষণের একটি প্রচেষ্টা। নিবন্ধে (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি, (খ) বাংলাদেশে মার্কিনী ও ভারতীয় স্বার্থ, (গ) এই দুই দেশের স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং (ঘ) মার্কিন-ভারত প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে আসার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২. মার্কিন ও ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি

২.১ রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয়ই পুজিঁবাদী রাষ্ট্র, যাদের মধ্যে পুঁজিবাদী চরিত্র বিদ্যমান। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের স্বাভাবিক প্রেরণা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয়ই অন্য দেশের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে শোষণ ও লূণ্ঠন করতে চায়। অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাই জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিই মার্কিন-ভারতের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎজা রাইসের ২০০০ সালে ফরেন এফেয়ার্স-এ লেখা এক নিবন্ধে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তার বক্তব্য হচ্ছে “(US Foreign Policy)...will also proceed from the firm ground of the national interest, not from the interests of an illusory international community...”

মার্কিনীদের ভাবশিষ্য ভারতের পররাষ্ট্রনীতি একই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই দুই দেশ প্রয়োজনে কোন দেশকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতেও দ্বিধা করবে না। সাম্প্রতিক অতীতে আমাদের সামনে ইরাক, আফগানিস্তান, সিকিম, নেপাল, ভুটানসহ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ভারতের নেতৃবৃন্দের মুখেও ‘Bangladesh has no right to exist’- জাতীয় বক্তব্য আমরা শুনতে পেয়েছি।

২.২ মার্কিন-ভারত পারস্পরিক সম্পর্ক

মার্কিন-ভারত পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ধারিত হয় এই দুই রাষ্ট্রের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা যদি আমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি তবে আমরা দেখতে পাবো যে বিশ্বের এক নম্বর মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে একেকটি অঞ্চলে একটি দেশের সাথে কৌশলগত মিত্রতা করেছে। যেমন ইউরোপীয় অঞ্চলে যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সাথে রয়েছে মার্কিনীদের কৌশলগত মিত্রতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ২০০০ সালে মার্চ মাসে ভারত সফর করার সময় যে ভিশন স্টেটমেন্ট স্বাক্ষর করেছেন তাতে বলা হয়েছে "A new century in which India and the US will be partners in peace, with a common interest in and complimentary responsibility for, ensuring regional and international security...and strategic stability in Asia and beyond..."

মনে রাখা প্রয়োজন যে যুক্তরাষ্ট্র যেমন সারাবিশ্বে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব, একইভাবে ভারত আঞ্চলিক পর্যায়ে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। জাতীয় স্বার্থের জন্য এই দুই দেশ যেমন একমত হতে পারে, তেমনি মতপার্থক্যও থাকতে পারে। আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের মধ্যে এই মতপার্থক্য নিহিত। উদাহরণ হিসেবে আবারো ইসরাইল ও যুক্তরাজ্যের সাথে মার্কিনীদের সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। ইসরাইলের সাথে মার্কিন সম্পর্কই নির্ধারণ করে দেয় মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করবে। যুক্তরাজ্যের সাথে মার্কিন সম্পর্কই নির্ধারণ করে দেয় ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করবে। একইভাবে ভারতের সাথে মার্কিনীদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় উপমহাদেশে কী ভূমিকা পালন করবে। তাই বলে ইসরাইল ও যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সববিষয়ে একমত হয় না। তারা সাধারণত বৃহত্তর আঞ্চলিক নীতির (Broader regional policy) পর্যায়ে একমত হলেও বিভিন্ন ইস্যুতে বা অঞ্চল ভূক্ত অন্যান্য দেশের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণে তাদের দ্বিমত সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তেমনি বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেও ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র সবসময় সববিষয়ে একমত নয়।

৩. বাংলাদেশে মার্কিন ও ভারতীয় স্বার্থ

মার্কিন ও ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার বাংলাদেশে মার্কিন ও ভারতীয় স্বার্থ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয়ের কাছে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক, কৌশলগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় ও মার্কিনীদের স্বার্থ অভিন্ন আর কোন কোন ক্ষেত্রে দুই দেশের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে।

৩.১ বাংলাদেশে মার্কিন ও ভারতীয় অভিন্ন স্বার্থ

আওয়ামী বিএনপি জোটের রাষ্ট্র পরিচালনায় ধারাবহিক ব্যর্থতার ফলে জনমনে শাসনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। ইসলামের উত্থান হলে ভারতের আঞ্চলিক কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই ভারত এখন বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে মার্কিন-ইহুদী স্টাইলে আগ্রাসন চালিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জনতা ও ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারত ভীত-সন্ত্রস্ত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এই রাজনৈতিক ইসলামের উত্থানকে ঠেকানোর জন্য ভারত

বদ্ধপরিকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যেভাবে ইরাক, আফগানিস্তান ও লেবাননের উপর ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, ভারতও বাংলাদেশে একই কায়দায় জঙ্গী দমনের অজুহাতে আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে কিনা, এই প্রশ্ন এখন সকলের।

আর অন্যদিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মার্কিনীরা আজকে তাদের একমাত্র আদর্শিক শত্রু ইসলামের উত্থানকে ঠেকাতে ব্যস্ত। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান ঠেকানোর মধ্য রয়েছে দুই দেশেরই অভিন্ন স্বার্থ। তবে এক্ষেত্রে দুই দেশের রয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কিনীরা বিষয়টিকে দেখে বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে (Global perspective) আর ভারত দেখে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ ও নিজের নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে।

৩.২ বাংলাদেশে মার্কিন ও ভারতীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব

আমরা দেখতে পেলাম যে রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান ঠেকানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই দুইটি দেশের রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। বাংলাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ভারত-মার্কিন দ্বন্দ্বই এদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মূল কারণ। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৩.২.১ রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের দ্বন্দ্ব

আগামী পৃথিবীর রাজনীতি এশিয়াকে ঘিরে আবর্তিত হবে। এশিয়ার রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে ভারত ও চীনের উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় রয়েছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন এবং ভারত ও চীনের মাঝখানে অবস্থিত একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। এই দুই উদীয়মান শক্তির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে নিজস্ব পদ্ধতিতে সম্পর্ক বজায় রাখছে। তবে এই উভয় রাষ্ট্রের উপর প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশকে প্রয়োজন। বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন ঘোষিত-অঘোষিত বাণিজ্যিক ও সামরিক চুক্তি তারই ইঙ্গিত বহন করে। বিভিন্ন সময়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রাম বন্দরের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মার্কিন কোম্পানী এসএসএ'র বাণিজ্যিক উদ্যোগ হাইকোর্ট কর্তৃক স্থগিত হলেও গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন (Deep sea port) প্রক্রিয়াধীন আছে। বাংলাদেশে মার্কিন বাহিনীর সদস্যদের বিচার করা যাবে না - এ মর্মেও চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে বলে শোনা যায়। কৌশলগত ভৌগলিক গুরুত্বের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সেনাঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই সমস্ত বিষয় মার্কিনীদের বাংলাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

অন্যদিকে কর্তৃত্বের দিক থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারত হতে চায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী তথা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারত চায় না তার আধিপত্যবাদে কেউ বাগড়া দেয়। এক্ষেত্রে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও বিন্দু মাত্র ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। আরো একটি বিষয় রয়েছে। একটি উন্নত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, স্থিতিশীল ও অর্থনৈতিকভাবে সফল বাংলাদেশ ভারতের জন্য রীতিমত নিরাপত্তা হুমকি। বাংলাদেশ সফল হলে ভারতের সেভেন সিষ্টার্সের মধ্যে স্বাধীনতার চাহিদা তীব্র হবে, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ভুলুণ্ঠিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও সীমান্ত আগ্রাসনের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার অপপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

আর সর্বশেষ গত দেড় মাসের অস্থিতিশীলতার সুযোগে ভারত ফারাক্কা বাঁধের সমতুল্য আরেকটি বাংলাদেশের জন্য মরণফাঁদ টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেভেন সিষ্টার্সের বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতা ভারতের একান্ত প্রয়োজন।

৩.২.২ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব

পৃথিবীতে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে অগ্রসরমান রাষ্ট্রের মধ্যে ভারত অন্যতম। Goldman Sachs একটি রিপোর্টে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন (BRIC) এই চারটি দেশকে অর্থনীতির দিক থেকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলেছে। অপরদিকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-এর গবেষণা সংস্থা NIC একটি রিপোর্টে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দু'টি দেশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাণিজ্যে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। বলাবাহুল্য যে দেশ দু'টি হলো ভারত ও চীন। বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতা হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য জ্বালানী সম্পদ একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ভারত এই মূহুর্তে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জ্বালানী ভোক্তা, বাংলাদেশের জ্বালানী সম্পদ তথা গ্যাস, তেল ও কয়লার দিকে তাই ভারতের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় তাই বলা যায় যে ভারতের অর্থনীতির স্বার্থে বাংলাদেশে টাটার বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য বাংলাদেশে ভারতের দালালরা এদেশের প্রয়োজন না মিটিয়েই ভারতে গ্যাস রপ্তানীর জন্য জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলো। টাটা এদেশের গ্যাস এবং কয়লার উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশে শিল্প গড়ে তোলার অপচেষ্টা করছে। আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ভারত ইতিমধ্যেই আমাদের বাজার পুরোটাই দখল করে ফেলেছে। শিল্পক্ষেত্রে যে বিষয় লক্ষণীয় তা হচ্ছে ভারত যেভাবে আমাদের পাট শিল্প ধ্বংস করেছে ঠিক সেভাবে চট্টগ্রাম বন্দর অবরুদ্ধ করে আমাদের গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংস করে বাংলাদেশকে ভারত নির্ভরশীল করতে চায়। এসবই বাংলাদেশের বাজার স্থায়ীভাবে ভারতের দখলে রাখার সুগভীর চক্রান্ত।

আবার অন্যদিকে মার্কিন কোম্পানীগুলোর বিনিয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মূলত জ্বালানী খাতে। সাম্প্রতিক সময়ে একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের কোম্পানীগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসছে। আমাদের বিশ্লেষণের জন্য যে বিষয়টি লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই বিনিয়োগ মার্কিনীদের অনুমতিক্রমে এবং উৎসাহে হচ্ছে। আর একটি ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যের অর্থের গন্তব্য হিসাবে পশ্চিমা বিশ্ব নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছে, সেহেতু উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে এশিয়া তাদের সবচেয়ে সম্ভাব্য ও সম্ভাবনাপূর্ণ বিনিয়োগ স্থলে পরিণত হয়েছে। এই বিনিয়োগের সংরক্ষণ ও বিকাশ মার্কিনীরা স্বাভাবিকভাবেই কামনা করবে। সুতরাং এখানে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্প ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।

এই আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন-ভারতের যেমন অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থ, লক্ষ্য ও পরিকল্পনা। বাংলাদেশেকে ঘিরে ভারতের স্বার্থের প্রেক্ষাপটে একথা বলা যায় যে ভারত বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা চায়। অস্থিতিশীলতার মাধ্যমেই বাংলাদেশে ভারতের সকল স্বার্থ আদায় করা সম্ভব। আর এজন্য ভারত বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা হিসেবে একটি ভঙ্গুর গণতন্ত্রের (Fragile democracy) পক্ষপাতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের জন্য একমাত্র শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের ফেরীওয়ালা। যদিও ইরাক, আফগানিস্তানে গণতন্ত্র গেলানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্যালেস্টাইন, আলজেরিয়া ও তুরস্কের গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা মার্কিনীদের জন্য অত্যন্ত তিক্ত। এরপরও ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশের মত পৃথিবীর বৃহৎ মুসলিম দেশকে মডারেট মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা মার্কিনীদের প্রয়োজন। বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে চমৎকার একটি মার্কিন গিনিপিগ। যেহেতু বাংলাদেশ তাদের জন্য নিরাপত্ত হুমকি নয়, তাই তারা চায় তথাকথিত স্থিতিশীল গণতন্ত্র (Stable democracy)। বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন-ভারত স্বার্থ বিশ্লেষণের পর এবার আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন সর্বশেষ গত দেড় মাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে।

৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণের শুরুতেই একথা বলে নিতে চাই যে বিগত দেড় মাসের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ অতি সরল বা সাদা কালো চোখে দেখার সুযোগ নেই। তবে আমরা সহজভাবে একটি বিশ্লেষণ প্রদান করেবো। বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন-ভারত স্বার্থের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশই চলমান এই অস্থিতিশীলতার মূল কারণ। মার্কিন-ভারতের দৃষ্টিতে গত দেড় দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিভিন্নমুখী পরিক্ষা (Experiment) হয়ে গেছে। বিএনপির সরকার, আওয়ামী লীগের ঐকমত্যের সরকার, বিএনপির জোট সরকার এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তারা দেখেছে। সুতরাং এখনই সময় ভবিষ্যতে কে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে তা নির্ধারণ করার - এটাই বাংলাদেশকে ঘিরে ভারত-মার্কিন দ্বন্দ্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশের উপর মার্কিন-ভারত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এই যুদ্ধে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালকে বেছে নিয়েছে। বিএনপি-আওয়ামী লীগের পরস্পরিক অবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত দূর্বল অন্তর্বতীকালীন শাসনব্যবস্থা। এই সরকারের কাজ হচ্ছে একটি অবাধ-সুষ্ঠু নিরপেক্ষ সবার জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের পরিবেশ তৈরী করা। এছাড়া এই অনির্বাচিত সরকার কোন নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, শুধু রুটিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই সময়কালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত নির্ধারণ করতে চায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তথা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি কে ডিক্টেট করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয়ই নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য বাংলাদেশের উপর তাদের একক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। এই পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুই জোটের মধ্যে ভারত এক পক্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরেক পক্ষ নিয়েছে। বাংলাদেশে মার্কিন-ভারতের সহায়ক শক্তি হিসেবে কারা রয়েছে তা তাদের বক্তব্য ও কার্যক্রমেই বোঝা যায়। এই দুই দেশ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ ও সুশীল সমাজসহ সবাইকে ব্যবহার করে। মার্কিন সহায়ক শক্তির বাস্তব সীমাবদ্ধতা থাকায় তা কাটিয়ে উঠার জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও ওয়াশিংটনকে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। আর অন্যদিকে ভারতকে প্রকাশ্য নড়াচড়া না করলেও চলে। অনুগত স্তাবক তাঁবেদাররা ভারতের হয়ে যখন যে কাজ করা প্রয়োজন তা করতে দ্বিধা করে না।

বিগত দেড় মাসের অস্থিতিশীল সময়ে এদেশের সুশীল সামাজ মার্কিন-ভারতের প্রভাব বলয়ের বাইরে থেকে কোন কাজ করেনি। প্রফেসর ইউনুসের কোয়ালিশন সরকার গঠনের ফর্মুলা এবং ড. কামালের জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের ফর্মুলাও যথাক্রমে মার্কিন ও

ভারতীয় মদদপুষ্ট। চারদলের সম্বর্ধনায় সুদখোর ড. ইউনুসের দ্বিদলীয় লুটপাটের প্রস্তাব প্রদানের মাধ্যমেই তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। তার ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র তো বিমোচন হবেই না বরং তা আরো বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে ড. কামালের ফর্মুলায় সেনাবাহিনীকে অন্তর্ভূক্ত করায় ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টাও দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। সুশীল সমাজ মূলত বিদেশী শক্তির তাঁবেদারীর মাধ্যমেই এদেশে বেঁচে আছে। যারা এই তথাকথিত সুশীল সমাজের অংশ বাংলাদেশে তাদের অবদান কতটুকু তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে যাদের একাধিক বাড়ী এবং নিজেদের সন্তানদের বিদেশে পড়াশোনা করায় যারা, শিকড়হীন এই মানুষগুলো হামিদ কারজাই বা চালাবির মতো বিদেশীদের মদদে ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহনের স্বপ্ন দেখে।

৫. মার্কিন-ভারত প্রভাব বলয় থেকে বের হবার উপায়

অনেকে বলে থাকেন যে ভারতের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদেরকে মার্কিন প্রভাব বলয়ের অধীনে থাকতে হবে। আবার অনেকে বলেন মার্কিন প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদেরকে ভারতের প্রভাব বলয়ের অধীনে থাকতে হবে। অথচ এই দুই দেশের প্রভাব বলয়ের বাইরে শক্তিশালী অবস্থান বাংলাদেশের পক্ষে নেয়া সম্ভব। বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল সংখ্যায় মুসলিম জনগোষ্ঠি। এই জনতাকে ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির উপায়।

নেতৃত্ব ও দূরদর্শী চিন্তা (Vision): খিলাফত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলে তবেই মার্কিন-ভারত প্রভাব বলয় থেকে বের হওয়া সম্ভব। আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র হবার কারণে খিলাফত সরকারের থাকবে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দূরদর্শী চিন্তা (Vision)। ইতিহাসে আমরা দেখেছি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অনুসারী সাহাবাদেরকে আপোষহীনভাবে সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকে সকল দাসত্ব থেকে মুক্ত করে খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে আনার দূরদর্শী চিন্তার (Vision) ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ী পতাকা উড়ানোর এই রাজনৈতিক উচ্চাশার ফলেই আরবের অনগ্রসর জাহেল সমাজ থেকে উঠে আসা সাহাবারা মদিনার মত ছোট্ট রাষ্ট্রে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাত্র বিশ বছরের মাঝে একই সাথে দু'টি পরাশক্তিকে (পারস্য ও রোমান) হারিয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব ইসলামের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের দু'শ বছর, রাশিয়া ও আমেরিকার পঞ্চাশ বছরের দুনিয়া শাসনের ইতিহাস থাকলেও খিলাফত রাষ্ট্রের রয়েছে হাজার বছরের একচ্ছত্রভাবে পরাশক্তি থাকার গৌরবময় অতীত। বাংলাদেশের মাটিতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই দেশের মানুষ মার্কিন-ভারত প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারবে এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাড়াতে সক্ষম হবে।

আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি: খিলাফত সরকার অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশকে করবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল। যে কোন জাতিকে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হয়, অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হয়। তাই খিলাফত রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে অবশ্যই নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে শিল্পায়নকে গুরুত্ব দিবে এবং নিজেদের বাজার পুনরুদ্ধার করবে। দারিদ্র বিমোচনের স্বার্থে খিলাফত রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা জনগণের ও রাষ্ট্রের সম্পদের একটি পাথর কণাকেও অলস ফেলে রাখবে না। খিলাফত ব্যবস্থা দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিবে এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নিবে।

শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান: খিলাফত রাষ্ট্রে জনগণ যেমন ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও ঠিক তেমনি ঐক্যবদ্ধ থাকবে। সেখানে আজকের মত দল ভিত্তিক বিভাজন থাকবে না। খিলাফত রাষ্ট্র জাতিকে বিশ্বের নেতৃত্ব দান করার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং সেই জাতিকে একটি দুর্ভেদ্য, শক্তিশালী, অপরাজেয় পরাশক্তিতে পরিণত করবে। এই জন্যে সশস্ত্রবাহিনীকে প্রয়োজনীয় লোকবল, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও বাজেট দেয়া হবে। যারা এই বাহিনীকে অর্থ বরাদ্দের বিরোধিতা করেন তারা শুধুমাত্র বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে একথা বলেন। একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কারনেই বাংলাদেশে দুই জোটের মারামারির মধ্যেও এখনও টিকে আছে।

সাহসী পররাষ্ট্রনীতি: বাংলাদেশের বর্তমান নতজানু পররাষ্ট্রনীতি কোন অবস্থাতেই বিদেশী হস্তক্ষেপ রোধ করতে পারবে না। আমাদের বর্তমান অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়"। এই রকম দূর্বল পররাষ্ট্রনীতি দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে বিদেশীদের প্রতি নতজানু ও তাঁবেদারী মনোভাব ছাড়া অন্যকিছু আশা করা যায় না। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

(১) ... এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না। (সুরা নিসা ১৪১)

(২) হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা, তারা একে অপরের বন্ধু ...। (সুরা মায়েদা - ৫১)

(৩) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন... । (সুরা মায়েদা - ৮২)

উপরোক্ত আয়াতসহ অসংখ্য আয়াত ও রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ থেকে এটা স্পষ্ট যে ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই অন্যের আধিপত্য মেনে নিতে পারেনা। তাই খিলাফত রাষ্ট্র কখনোই কোন রাষ্ট্রের প্রতি নতজানু নীতি অবলম্বন করবে না এবং দেশের রাজনীতিতে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না।

৬. উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বাংলাদেশের পক্ষে একটি সাহসী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা সম্ভব। আর একমাত্র খিলাফত সরকারই পারে বাংলাদেশকে বিদেশীদের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করতে। বিদেশীদের তাঁবেদারীর পথ থেকে মুক্ত করে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার পথ দেখায় খিলাফত রাষ্ট্র। আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়াতা'য়ালা বলেন,

"হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে দৃঢ় পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" (সুরা মুহাম্মদঃ ৭)

প্রথম ড্রাফ্ট

ঢাকা

১২/১২/০৬

হিযবুত তাহ্রীর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।